সাতদৌলা রহস্য

বণ মাইতি

দোল দোল দুলুনি

কোদালের কোপটা মাটির বুকে বসতেই একটা আওয়াজ উঠল। পাথর বা মাটি থেকে ওঠা আওয়াজ নয়। একটু অন্যরকম। পিতলের কলসী বা গাগরা নয় তো? মদনের হৃৎপিণ্ডটা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। সে মাথা তুলে তাকাল ফুলির দিকে। ফুলি তারই দিকে চেয়ে। দুজনের মুখেই তখন ভাষা সরছিল না। তবে দুজনের চোখেই ফুটে উঠছিল আলো র ঝিলিক। ফুলির মনে হল ঠাকুর তার ডাক শুনেছেন। মদনের মনে হচ্ছিল, তার পরিশ্রম বোধ হয় সার্থক হল।

লাউফুলি জোছনায় তখন চরাচর ভেসে যাচ্ছিল। গতকাল পূর্ণিমা গেছে। আজও চাঁদের জেল্লায় ভাটা পড়েনি। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। সন্ধ্যার সেই গুমোটটা আর নেই। তবু মদন দরদর করে ঘেমে চলেছিল। পরিশ্রম তোকম হচ্ছে না। ক দিন ধরেই রাত জেগে সে আর ফুলি মাটি খুঁড়ে চলেছে। দিনমানে কাজ করার উপায় নেই, পাঁচজনে জেনে যাবে। কাজ করতে হচ্ছে গোপনে। রাত নিশুত হলে। অথচ সে নিজের জমিতেই কাজ করছে। তবু চোরের মতন এই সতর্কতা। আসলে সে তো মাটি খুঁড়ছে না, খুঁজছে গুপ্তধন। দু - রাত্রি বৃথা গেছে। আজ বোধ হয় কপালফিরল।

মদন নিজেকে সামলে নিয়ে চাপা স্বরে ফুলিকে বলল, জল্‌দিকি হারকিন্‌টা লি আয়।

তরতলে জোছনায় হ্যারিকেনটার তেমন প্রয়োজন হচ্ছিল না। নাবিয়ে রাখা ছিল একটু তফাতে। ফুলি যেন হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে তুলে আনল ওটা। পলতে উজিয়ে দিতে গিয়ে উত্তেজনার জেরে এতটাই বাড়িয়ে ফেলল যে কালো ধোঁয়ার ভরে গেল চিমনির ভেতরটা। অন্য সময়ে হলে মদন খেঁকিয়ে উঠত, গটে কাজ ও যদি তোরে দিদি ঠিকমত হয়। তবে এখন এসব কথা তার মাথাতেই এলো না। ফুলি ততক্ষণে তার কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে মাটি সরাতে লাগল। কী জানি ভেতরে কী আছে। দু জনারই বুকের ভিতর তখন দোল খাচ্ছে অদৃশ্যদোলনা। আশা থেকে নিরাশায়। আবার নিরাশা থেকে আশায়।

হিংটিং ছট

বইটি খোলা। অমলেন্দুবাবুর দৃষ্টি ওরই ওপর। কিন্তু পড়ে চলেছেন এ কথা বলা যায় না। ক দিন ধরেই এমন হচ্ছে। কেবলই অন্যমনস্কতা। আসলে একটা ব্যাপার নিয়ে এমন সমস্যায় পড়েছেন যে কুল কিনারা পাচ্ছেন না। একটা জনপদ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু তার স্মৃতি !

অথচ মাত্র একশ / দেড়শ বছর আগেও নামটার অস্তিত্ব ছিল। আজ নেই। ১৮৭৩ সালের আরকিওলজি অব্ ডিস্ট্রিক্ট মিডনাপুরের এক রিপোর্টে হ্যারিসন সাহেব পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন সাত দৌলার থেকে প্রায় ছাবিবশলক্ষ ইট, এবং প্রচুর পাথর নিয়ে রাস্তার কাজে লাগানো হয়েছিল। প্রচুর ইট পাথর তখনও ছিল মাটির ভিতর। অর্থাৎ এই দুইস্থানে নিশ্চয়ই ছিল প্রাচীন কোন স্থাপত্যের ধবংসাবশেষ। ইংরেজরা সাধারণত প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে যত্নশীল হল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কেন যে তাঁরা নির্দ্বিধায় ধবংস করে ফেললেন এই মূল্যবান ধবংসাবশেষ। একটু তৎপর হলে সেদিনই হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতো প্রাচীন দন্তপুরকে। অমলেন্দুবাবুর খুবই আপশোশ হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর বর্তমান সমস্যা সেটা নয়,

সমস্যা সাত দৌলাকে লোকেট করা। মোগলমারি গ্রামটা এখনও সজীব - জীবন্ত এবং মাটির নীচে যে আর একটি জনপদের কংকাল লুকিয়ে আছে, সে আভাস পাওয়া যায়। ওখানকার একটি ঢিবি যাকেলোকে সখিনেরা পাঠশালা বলে, সেটি খুঁড়লে কিছু না নিদর্শন পাওয়া যাবেই। এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী। কিন্তু সাত দৌলা? সাতদৌলার অবস্থানও তো মোগলমারির মতো ও টি রোডের আশেপাশে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তুএ নামে কোন গ্রামই নেই। নেই কাছাকাছি নামেরও। তাহলে?

অমলেন্দু বাবু চেয়ার চেড়ে জানালার কাছে এলেন। জানালার ওপাশে দত্তদের দিঘি। বেশ বড়। বিঘে পাঁচেকের। তার ওপাশে একটা বাগান ছিল। এখন নেই। ও দিকে চোখ গেলেই তাঁর বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। পারতপক্ষে ওদিকে তাকান না আর। বছর খানেক আগে বাগানটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওখানে এখন একটা দোতলা বাড়ি উঠেছে। অবশিষ্ট ফাঁকা জায়গায় কিছু ইউক্যালিপট্যাসের চারা। লিক্‌লিকে চেহারা নিয়ে ওরা দ্রুত বড় হয়ে উঠেছে। হয়তো এটাই বাস্তবতা। তবু মেনে নিতে তাঁর কষ্ট হয়। তাঁদের ছোট্ট শহরটা দ্রুত সাবালক হয়ে উঠেছে। কিন্তুএকদিন তো এখানেই কোথাও এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল? কিন্তু কোথায়?

অমলেন্দুবাবু ইতিহাসের লোক নন। লোক সংস্কৃতি তাঁর সাবজেক্ট। এ বিষয়ে তাঁর অনেক গুত্বপূর্ণ কাজ আছে, গুনীজন সমাদৃতও হয়েছে। রিটায়ার করার পর তিনি কাজের পরিধি বাড়িয়েছেন। এখন তো আর পড়ানোরঝামেলা নেই। সুতরাং নিজস্ব কাজ করার জন্য ইচ্ছে মতো সময় ব্যয় করা যায়। কিন্তু কতটুকুই বা সময় তাঁর জমার খাতায় অবশিষ্ট আছে? হয়তো সামনের কোন একদিন দূম্ করে জীবনদীপ নিভে গেল। অথচ কত কাজ এখনও বাকী! ভাবনাগুলো তাঁর মাথায় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। তিনি একটার পর একটা নিয়ে কাজ করতে চান। যতটা পারেন তাই সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তিনি যত্নশীল। অবশ্য তিনি বরাবরই সময়নিষ্ঠ। এখন তা আরও বেড়েছে।ভোর চারটায় ওঠেন। কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করেন। তারপর বাথমে ঢোকেন। ওখান থেকে যখন বেরোন তখনও বাড়িটা নিদ্রিত। তিনি কাউকে ডিস্টার্ব করেন না। ছেলের বউকে তো নয়ই, নিজের বউকেও না। নিজে ওভেন জ্বালিয়ে চা বসান। তারপর সটান ঢুকে পড়েন পড়ার ঘরে। কিন্তু ক দিন ধরে তাঁর কাজ একচুলও এগুচ্ছে না। সম্প্রতি স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে পড়েছেন। কিছু বইপত্র আনিয়েছেন। ইতিহাসের মানুষজনের সাথে আলোচনা করেছেন। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিও করতে হচ্ছে কিন্তু যে গাঁট্টায় আটকে গেছেন তা হল সাতদৌলা। এই নামের কোন গ্রাম তো তিনি খুঁজে পানই নি, উপরন্তু কোন গাথা, জনশ্রুতি কিংবা কোন প্রাচীন বইপত্রের মধ্যেও গ্রামটির উল্লেখ নেই। অথচ হ্যারিসন সাহেব তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন। তাহলে কী তিনি ভুল করেছেন? সেক্ষেত্রে তো কাছাকাছি নামের অন্যকোন স্থান থাকবে, যেখানে পোড়ো ইট - পাথরের স্তূপ ছিল! খুবই জটিল ব্যাপার। অমলেন্দুবাবু ঘরের ভিতর পায়চারি করেই যেতে লাগলেন। আর মনেরভিতর মাকু চলিতে লাগল সাতদৌলা - টু - সাতদৌলা। সাতদৌলা - টু - সাতদৌলা।

আমাদের নদীর নামটি

নামটা কেন বড়সড়। ওজনদার, চেক্‌নাইওয়ালা। রূপের পাখসাটে ঢেউ জাগা বুকে। কিন্তু নদীটি শীর্ণ। ধূধূ করা বিস্তীর্ণ বালিরাশি। অভ্রকুচির চোখ ঠারানো হাসি। আর নুড়ি পাথরের উদাসীন নীরবতা। তার মাঝদিয়ে তির্‌তির্ করে বয়ে চলেছে কাকচক্ষু জল। মুমূর্ষু অথচ স্বপ্নমাখা চোখ। যেন কারও বিদ্ধে কোন অভিযোগ নেই অভিমানিনীর।

বয়স্করা অবশ্য আর এক নদীর কথা বলে। উদ্ভিন্ন যৌবনা, মদমত্তা এক খ্যাপা স্রোতস্বিনী। যার বুকের উপর সারা বছর চলাচল করে মালবওয়া নৌকো। আরও অনেক অনেক আগে নাকি সওদাগরি পালতোলা নৌকো বুকেধারণ করত এই গরবিনী নদী। সে এক সুখের সময়। দন্তপুরের জৌলুষ তখন তাকেই কেন্দ্র করে। এত বড় বাণিজ্য নগরী এ তল্লাটে আর নেই। হয়তো সে ছিল বন্দর নগরীও। তার রেশম - তসরের খ্যাতি ছাড়িয়ে গেছিল দূর - দূরান্তে। তখন সুবর্ণরেখার তীরে তীরে ছিল সমৃদ্ধ তাঁতীদের বসতি। আর ছিল শাঁখের কারিগর। সোলার কারিগর। কোথাও বা আখের খেতের পাশে বসে গেছে আখশাল। স সুগন্ধি চালে ভরে উঠেছে নৌকোর খোল। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার নুনিয়ারা নুন মারছে, আর সে নুন গর গাড়ির বোঝাই হয়ে চলে আসছে দন্তপুরে। জঙ্গলমহল থেকে আসছে তাজা মহুল এবং মহুলের আরক। সে আরকে আচ্ছন্ন বিদেশি বণিকেরা লুটিয়ে আছে নগরনটীর গৃহে। সে একস্বর্ণযুগ। সে যুগের কথা শুনেছে বয়স্করা তাদের ব

াপ - ঠাকুরদার মুখে। তারা শুনেছে তাদেরও বাপ - ঠাকুরদারকাছে। কী জানি কবে হারিয়ে গেছে সে দিন। হয়তো এই নদীর বুকেই একদিন অস্ত গেছে সেই স্বর্ণরবি।
অভিমান জাগা তার স্বাভাবিক। বিগত যৌবনী নদীটির কীই বা আছে এখন। শুধু নামটুকু ছাড়া। তাই সে এই সম্পদটুকু বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে আছে পরম মমতায়। যখন বর্ষার মেঘ সুদূর সাগর থেকে উড়ে এসে তাকেই মধুস্বরে ডাকে সু - ব - র্ণ - রে - খা - তখন সবাই বিস্ময়ে দেখে আনন্দে খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে সেই নদী। হয়তো অল্প কয়েকদিনের জন্য ত ার এই উচ্ছলতা। তা হোক, তবু তা বিগত দিনের সুখ - স্মৃতি - জাগক। তাই সে এই দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করে থ াকে। শুধু এই দিনগুলির জন্য।

আম আঁটির ভেঁপু

শ্রীমন্ত গতকাল রাতে পৌঁছেছে। প্রায় বছর দশেক পর নিজের গ্রামে এল। শেষবার এসেছিল মায়ের শ্রাদ্ধের সময়। বাবা মারা যাওয়ার পর সে মাকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল, চলে যাওয়ার পর সে প্রয়োজনের ইতি।বলতে গেলে এব ারও এসেছে এক শ্রাদ্ধে। নাড়ির শেষ টানটুকু ছিঁড়ে ফেলতে। স্বেচ্ছায়। ঠিক স্বেচ্ছায় কী? হয়তোতাই। হয়তো বা তা নয়। কে যেন বলেছিলেন কথাটা, লাইফ ইজ নট বাট কম্প্রোমাইজেশন। ফোঁস করেশ্বাস ফেলে বুকের ভ্যাকাম ক্লিয়ার করল শ্রীমন্ত। বাস্তটা আজই রেজিষ্ট্রি হবে।
আজ বিকেলেই কলকাতায় ফিরে যাবে সে। ব্যস্ত মানুষ। হাসপাতালের ডিউটি না হয় দু একদিন ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু নিজের চেম্বার? একদিন অফ্ করা মানেই হাজার পাঁচেক টাকা লস্। তাই কিছুতেই থাকা চলবে না।
সকাল সকাল উঠে গ্রামটা দেখতে বেরিয়েছে সে। গতকাল সন্ধ্যায় যখন দাঁতন স্টেশনে নেমেছিল, কেমন যেন অচেনা অচেনা ঠেকছিল চারদিক। স্টেশনটার হয়তো তেমন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তারপর? সেই ছেলেবেলার গা ছমছন করা ভূতুরে ফাঁকা প্রান্তরের মৃত্যুঘন্টা বাজার ইঙ্গিত দশ বছর আগেই টের পেয়েছিল, এবার দেখল সেই মৃত্যু যজ্ঞ স ম্পন্ন। ভ্যানরিক্সায় চেপে আসতে আসতে দেখছিল ঠাসা বাড়ি ঘর। দোকান - পাট। ফাঁকা মাঠেএকক প্রহরীর মতন দাঁ ড়িয়ে থাকা সেই পরিচিত কলেজটা পর্যন্ত ভীড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সে কখন যে তাকে পেরিয়ে এসেছে টেরও প ায়নি। অবশ্য এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। সারা পৃথিবীই পাল্টে যাচ্ছে। তাদের কলকাতাও কী সেই আগের মতো আছে? ত াদের কলকাতা! হঠাৎ সচকিত হল শ্রীমন্ত। ভাত খেতে খেতে দাঁতে কাঁকর কেটে ফেললে যেমন একটা অনভিপ্রেত অভিঘ াতে শরীর পেঁপে ওঠে, তাদের শব্দটা তেমনি কাঁপিয়ে দিল তাকে। তারভাবনাকে। আপন মনেই হেসে উঠল সে। এখন থেকে তাদের গ্রামটা আর তার থাকবে না। হয়তো অনেকদিনই নেই। সে টের পায়নি। কিংবা টের পেতে চায়নি। কিংবা থ াকলেও শুকনো পাতার মতো কোন এক অপাঙ্‌ক্তেয় কোণেলুটিয়ে পড়ে ছিল। আজ তারই বিসর্জন।
তাদের গাঁয়ের চেহারাটও বেশ বদলেছে। কাঁচা রাস্তার বদলে মোরাম রাস্তা। তার পাশে ইলেকট্রিকের পোস্ট। এখানে ওখানে ঘাড় উঁচু করে আকাশে হাত ছড়িয়ে দিয়েছে টিভি অ্যান্টেনা। রাস্তার লাল ধুলো উড়িয়ে ছোটাছুটি করছে মোটর সাইকেল।
এমন এক মোটর সাইকেল গাঁক করে ব্রেক কশে দাঁড়াল, বলতে গেলে, শ্রীমন্তর গা ঘেঁষে। বিরক্তিভরা দৃষ্টি নিয়ে সে চোখ ফেরাতেই দেখল নীল রঙের হিরো হন্ডার উপর বসে একজন মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা মাঝ বয়সি। পরনে চেককাটা লুঙি লাল আর কালচে সবুজ কলারহীন গোল গলার গেঞ্জি ব্লকের কাছে কী সব লেখা দেখায়। মাথায় কলপ করা চুল। যার কালোডগা ক্রমশ খয়েরি হয়ে গোড়ার দিকে অফহোয়াইটে পরিণত হয়েছে। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হ াসছে।
---কী রে শ্রীমন্ত, চিনতে পারছিস?
গলাটা চেনা চেনা লাগে। তবে স্মরণে আনতে পারে না সে। কেবলই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়।
---অবশ্য চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। তুই এখন কলকাতার নাম করা ডাক্তার, সল্টলেকে বাড়ি। আর আমি সেই ধড়ধড়ে এক্তারপুরের রমেশ।
---তুই রমেশ!

শ্রীমন্তর চোখে মুখে তখন জড় হয়েছে একরাশ বিস্ময়।
---যাক্ বাবা, নামটা অন্তত মনে রেখেছিস। আমার সৌভাগ্য।
রমেশের সাথে ছোটলেবায় সে কত দস্যিপনা করে বেড়িয়েছে ! সে সব দিন ভোলার নয়, ভোলা যায় না। কিন্তু সে রমেশ, আর আজ আজকের রমেশের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সে বলে, কী চেহারা করেছিসরে তুই ! তোর সেই ব্যায়াম করা পেটাই চেহারা, মাথার বাবরি চুল -- সে সব কোথায় ! তাছাড়া এই বিচিত্র পোশাকই বা পরেছিস কেন? তুই তো খুব সৌখিন ছিলি।
শ্রীমন্তর শেষের মন্তব্যটা কানে যেতেই রমেশ দৃষ্টি ফেরাল নিজের দিকে। তারপর হো হো করে ফেটে পড়ল প্রাণখোলা দর াজ হাসিতে। শ্রীমন্তর একবার আর কোন দ্বিধা থাকল না রমেশকে রমেশের সাথে মেলাতে।
হাসি থামিয়ে রমেশ বলল। তা কী করব বল, চাকরি বাকরি তো হল না। রীতিমতো খেটে খাই। তোদের মতো ঠান্ডা ঘরে বসে রোগীর বুকে স্টেথো বসিয়ে নম্বরী কামানো নয়, হাড় জল করে খাটা। রোদেপুড়ে, পাঁক জল মেখে।
শ্রীমন্তর কাছে রমেশের কথা হেঁয়ালির মতো ঠেকল। সে বোকার মতন চেয়ে ছিল রমেশের দিকে।
রমেশ শ্রীমন্তর মনের কথা আঁচ করে বলল, আমি এখন মৎস্যচাষী, বুঝলি। সেই কথায় আছে না, মৎস্য ধরিব, খাইব সুখে -
কথাটা বলেই রমেশ আবার হো হো করে হেসে উঠল।
পরে হাসি সামলে আবার বলল, তোর মতন না হলেও মন্দ কামাই না বুঝলি। এইটে কিনেছি মাস ছয়েক আগে।
বলেই হিরোহন্ডারটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করল সে। তারপর বলল তোর নিশ্চয়ই চার চাকা ?
শ্রীমন্ত ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে নীরবেই উত্তর দেয়।
রমেশ বলে, আজ সন্ধ্যায় চলে আয় আমার বাড়িতে। জমিয়ে দুই পুরানো বন্ধু মিলে আড্ডা দেওয়া যাবে। কালকেই একট া রাম আনিয়েছি। একদম ফরেন। দিশি মুরগির কষা দিয়ে যা জমবে না ! দুজনে মিলে ছোটবেলাটাকে সেলিব্রেট করব। ত াহলে, এই কথাই রইল, সাতটা নাগাদ চলে আয়।
বলেই রমেশ মোটর সাইকেলের স্টাটারে লাথি কশাতে যাচ্ছিল। শ্রীমন্তের কথায় থমকে গেল।
শ্রীমন্ত ড্রিংক করে না। হোস্টেলে থাকার সময় দু একবার সহপাঠীদের সঙ্গ দিয়েছে। ব্যস, এখানেই ইতি, তাছাড়া বিকেলে তাকে কলকাতার দিকে রওনা দিতেই হবে।
রমেশ বিমর্ষ হয়। বলে, থেকেই না হয় গেলি একটা রাত্তির বাড়ির বাইরে, আবার কবে দেখা হবে ঠিক নেই।
শ্রীমন্ত বলে, উপায় নেই ভাই। তোর অফারের জন্য ধন্যবাদ।
ভদ্রতা করছিস ? মারব পেটে এক ঘুষি--
রমেশের ওটাও একটা মুদ্রাদোষ। শ্রীমন্ত শুনে খুশি হয়।
রমেশ বলে, তা কোথায় চলেছিস সাতসকালে
---এই একটু গ্রামটা ঘুরে দেখছি।
---গ্রামে আবার কী দেখার আছে ! সেই থোড় বাড়ি খাড়া খাড়াবড়ি থোড়। তবে হ্যাঁ পশ্চিম পাড়া ছাড়িয়ে দনের দিকে চলে যা, তোর চোখ একদম ট্যারা হয়ে যাবে।
দনে কী এমন হচ্ছে দেখার মতো ! শ্রীমন্ত অবাক হয়। তাদের গ্রামের পশ্চিম ঘেঁষেই নাকি এককালে সুবর্ণরেখা বয়ে যেত। সেই নদী ক্রমশ পশ্চিমে সরতে সরতে এখন পাঁচ - শ মাইল দূরে। কিন্তু নদী যে এককালে গ্রাম ছুঁয়েই বইত তার প্রকৃষ্ট প্রম াণ ভূমির গঠন। গ্রামের পশ্চিম সীমার পর হঠাৎ জমি নিচু হয়ে গেছে। নদীখাতে পলি জমে যেমন হয়। উর্বর এবং একটানা সমতল। সেই জমিরই নাম দন। হয়তো এককালে দহ দিল ওখানে। তাই থেকে দন শব্দ। কিংবা জলা জমির জল শব্দের অপভ্রংশও হতে পারে। শ্রীমন্ত ভাষাবিদ নয়। ইতিহাসের গবেষকও নয়, তবু এই মুহূর্তে এইসব গুগম্ভীর চিন্তা ঢুকে পড়েছিল তার মাথায়।
---বাইপাস হচ্ছে রে। প্রধানমন্ত্রীর সোনালি চতুর্ভুজ না কি যেন বলে। সিক্সলেন হাইওয়ে। দাঁতন এড়িয়ে আমাদের এত্ত ারপুর ঘেঁষে তারই বাইপাস। যা কর্মযজ্ঞ, হচ্ছে না, না দেখলে বিশ্বেস করতে পারবিনা। দেখবি, একদিন আমাদের এএ গ্র

াম তোদের নিউটাউন শিপ হয়ে যাবে।
শ্রীমন্ত শুনেছিল অবশ্য এদিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। তবে সেটা যে তাদের গ্রামের গায়ে গা ঠেকিয়ে তা জানত না। সে মনে মনে হাসল। রমেশটা চিরকালই পাগল, তাকে হাইওয়ে দেখতে পাঠাচ্ছে।
আর হ্যাঁ, হাড়িয়াপাদটাও একবার ঘুরে আসবি। দেখার তেমন কিছু নেই অবশ্য। তবে তোরা শিক্ষিত মানুষ তোদের ভ াল লাগবে। কি সব প্রা তাত্ত্বিক নিদর্শন টিদর্শন বেরিয়েছে।
রমেশের লাথি, আর কানমলা খেয়ে মোটর সাইকেলটা গাঁক, গাঁক আওয়াজ করে জেগে উঠল। তার তারই সাথে পাল্লা দিয়ে গলা চড়িয়ে রমেশ বলল, চলিরে শ্রীমন্ত, চারচারটে পুকুরে জাল নেমেছে আজ। একটু বে - খেয়াল হলেই জালি ব্য াটারা আমার পোঙা ফাঁক করে দিবে।
ধোঁয়া আর লাল ধুলোর ঘূর্ণির ভিতর ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ শ্রীমন্তর মনে হল একটা অদ্ভুতশব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে তার দিকে। চেনা, কিন্তু বিবর্ণ। হয়তো কোন বাচচা আমের আঁটির ভেঁপুতে ফুঁ দিচ্ছে।

যেখানে দেখিবে ছাই
দন্তপুরই কী দাঁতন ? সখি সেনার পাঠশালা আসলে কী? আর সাতদৌলা? ১৮৭৩ সালে গ্রামটা যদি জলজ্যান্ত অবস্থ ায় নাও থাকে, ক্ষয়াটে পাঁজর আগলে নিশ্চয়ই বসে ছিল। সে কোথায় হারিয়ে গেল? জটটা ছাড়াতে পারলে তবেই রহস্যটার সমাধানে কয়েক ধাপ এগুলো যাবে। অথচ অমলেন্দুবাবু একচুল এগুতে পারছেন না।
তিনি লেখালেখি করেন লম্বা বাঁধানো খাতায়। সেই রকম একটা খাতায় হাবিজাবি লাইন টেনে চলেছিলেন। যেন একটা ব াচচা কাটাকুটি খেলছে। প্রতিমা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পায়ের শব্দ অমলেন্দুবাবু টেরও পেলেন না। প্রতিমা ইচ্ছে করে গলা ঝাড়ার আওয়াজ করলেন এবার অবশ্য তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল। তিনি চোখ তুলতেই প্রতিমা বললেন, তুমি কী নাওয়া - খাওয়াও ছেড়ে দিলে নাকি ?
অমলেন্দুবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলেন। এখন সাড়ে বারোটা। রিটায়ার করার পরও তিনি প্রায় ঘড়ি ধরেই চান করতে যান, খেতে বসেন। সাড়ে এগারোয় চান, বারোটায় খেতে বসা। আজ কখন যে এত বেলা হয়ে গেছে, তিনি টেরই পাননি। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।
প্রতিমা তখনও গজগজ করে চলেছেন। তাড়াতাড়ি যাও। চান - খাওয়া সেরে আমাকে উদ্ধার কর। ঐ সব ছাইপাঁশ নিয়ে ডুবে থেকে কী যে পাও ! দিনরাত লেখা পড়া, পড়া আর লেখা। ঘর- সংসারে যেন আর কোন কাজ নেই।
কেন তোমরা তো করছ? অমলেন্দুবাবুর গোঁজ দেওয়ার চেষ্টা।
সে তো সারা জীবনই করছি, মরার আগে পর্যন্ত করতে হবে, সেও জানি। যেমন বাপ, তার তেমনি ব্যাটা।একজন পড়ে অ াছেন বই গুঁজে, আর একজন বেলা আটটা - নটায় ঘুম থেকে উঠে নাকে মুখে গুঁজে অফিসে ছোটেন, আর সেখান থেকে ফিরেই ছোটেন আড্ডা দিতে। বিয়ে দিয়েও কী হাতি - ঘোড়া পরিবর্তনটা হল তার? সংসারে যদি মন নাইই দিবি তবে বিয়ে করা কেন?
অমলেন্দুবাবু প্রতিমার এসব কথায় আদৌ কান দিচ্ছিলেন না। তিনি সে আদ্যিকাল থেকে এসব শুনে আসছেন। অবশ্য প্রতিমাই তো সংসারটাকে সামলেসুমলে রেখেছে। তিনি কোনকালেই কিছু করেননি। প্রতিমা সব কিছু নিপুণ হাতে করবে এবং গজগজও করবে, এটাই রেওয়াজ। তিনি স্ত্রীর এই গজগজানির মধ্যে হঠাৎ আজ আলটপকা বলে বসলেন, আ,চ্ছা তমা, আমাদের আশেপাশে সাতদৌলা বলে কোন গ্রাম আছে?
প্রতিমা লোক্যাল মেয়ে।শ্বশুরবাড়ী আর বাপের বাড়ীর দূরত্ব মাত্র মাইল খানেক। আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে তাঁর মোট ামুটি ভালই ধারণা। তিনি কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, কই, না তো সাতদৌলা বলে কোন গ্রামের নাম তো কখনও শুনিনি।
তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেছে, সেভাবে বলে উঠলেন, তবে সাতডুবিয়া বলে একটা গ্রাম আছে।
--- সাতডুবিয়া? কোথায় গ্রামটা? আগে কখনও এমন নাম শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।
--- আমি ও কী ছাই শুনেছিলাম নাকি। আজ সকালেই মুখীর মায়ের কাছ থেকে শুনলাম।

--- মুখীর মা ? আমাদের নতুন ঠিকে ঝি ?
--- হ্যাঁ, ও বলছিল ওদের সাতডুবিয়া গাঁয়ে নাকি মাটির নীচ থেকে কীসব পাথর - টাথর বেরিয়েছে।
--- পাথর বেরিয়েছে ?
--- বাড়ির দেয়াল না কী যেন।
--- বাড়ির দেয়াল!
অমলেন্দুবাবু আরও বিস্মিত হন। কই তিনি তো কিছুই শোনেননি। অবশ্য ক দিন ধরে তিনি বাড়ির বাইরে বেরোননি।
--- এত বড় খবর, আমাকে আগে বলনি কেন?
--- কী মুস্কিল, বললাম না তোমাকে আজ সকালেই শুনেছি।
--- আচ্ছা, মুখীবুড়ির বাড়ি সাতডুবিয়ায় বলে বলছ, কিন্তু আমি তো একদিন জানতাম ওর বাড়ি এত্তারপুরে।
--- এই দেখ, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি, এত্তারপুরের একটা অংশকেই নাকি ওখানকার লোকেরা কেউ কেউ সাতডুবিয়া বলে।
অমলেন্দুবাবুর পারলে ইউরেকা বলে প্রতিমাকে তক্ষুনি জড়িয়ে ধরতেন। এতটাই তাঁর আনন্দ হচ্ছিল। মাটির ভিতর থেকে পুরানো দেয়াল বেনো তারপর সাতডুবিয়া গ্রাম এবং সাতদৌলা - তিনি দ্রুত একটা সমীকরণ খুঁজে পাচ্ছিলেন যেন। সত্যিই কী সেই সাতরাজার ধন মানিককে খুঁজে পাওয়া গেল!
তিনি দ্রুত বাথমের দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে প্রতিমার উদ্দেশ্যে বললেন, শিগ্‌গির খেতে দাও, আমাকে সাতডুবিয়া যেতে হবে।
এসো মা লক্ষ্মী
অর্জুন গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছিল মদন। তবে অর্জুন গাছের মতন নয়, ঝড়ে ভেঙে যাওয়া তারডালের মতন। পরাজিত। বাতিল। বিষণ্ণতায় নিথর। সে বিষণ্ণতা মরা জোছনাতেও। দূরে কোথাও ডেকে উঠল শেয়ালের দল। সেই বিষণ্ণতা ফুঁড়ে মূর্তিমান হাহাকারে মদন চমকে উঠে তাকাল ফুলির দিকে।
ফুলি কিন্তু বেজায় খুশী। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল কলসিটাকে। কলসি ঠিক নয়, ঘটের মতন। সম্ভবত পিতলের। তামারও হতে পারে। কালচে মেরে গেছে। হয়তো মা লক্ষীর ঘট। কোনকালে তারই মতন কোনওবউ সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় ঘরে বসিয়ে পূজা করত।
ফুলি হাসি হাসি চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কিন্তু আমার। ঘষি মাজি কি সাফ সুতোর করি কি, আমি না লক্ষ্মীর ঘট তুলব।
ফুলির বাপের বাড়ি আরামবাগে। এখানে এসে এদিককার ভাষা বুঝতেই পারত না। এখন অদ্ভুত এক খিচুড়ি ভাষায় কথা বলে। এই নিয়ে মদন খ্যাপায় তাকে। কিন্তু এখন মদনের সেদিকে নজর দেবার মতন মুড ছিল না। হতাশা আর ক্ষোভে গুমরে উঠছিল তার মন। সমস্ত রাগটাই গিয়ে পড়ছিল সামন্ত বুড়োর উপর। সামন্ত বুড়োই যতনষ্টের গোড়া। সেই তার মাথার মধ্যে লোভের পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বলে কি না, মদন, তুই তো অখন রাজা রে। তোর ভিটের তলায় রাজপ্রাসাদ। নিশ্চয়ই মোহর ভরা সিন্দুক - টিন্দুকও আছে। মাটি খুঁড়লে কত কি বারহিবে।
কথাটা ফুলিকে বলতেই ফুলিও লাফিয়ে উঠেছিল। শু হয়েছিল তাদের নিশি অভিযান। কিন্তু সব বেগারখাটা। পিতলের কলসি! কত আশা নিয়ে শাবলের গুঁতো মেরে মেরে ভিতরটা পরিষ্কার করল। কিন্তু ভিতর থেকে একটা তামার ছাঁদা পয়সাও ঝরে পড়ল না।
ফুলি, মদনের গা ঘেঁষে বসল। বলল, এত ভাঙি পড়ছ কেন? যা হোক তো একটা কলসী পাওয়া গেল। এরপর হয়ত সত্যি সত্যি গুপ্তধন মিলবে।
আমি আর এ পথ মাড়িইটি নি। গুপ্তধন যদি রয়বি, কুষ্ঠি আছে, কী করিকি বুঝবু? যত্তসব মাগনা পরিশ্রম। আর যদি পুলিশ জানতে পারে, হাতে হাত কড়া পরিইকি একদম শ্রী ঘর।
কেন, শ্রীঘর কেন? এটা তো আমাদের জমি। নিজের জমি নিজে খুঁড়লে অপরাধ কীসের ?
ফুলি বিস্মিত হয়। মদন বলে, অউরকমই নাকি আইন। আমি আজ গৌরবাবুর কাছু শুনলি। জমিটা আমার হিলেও জমির

তলাটা সরকারের।
ফুলি ভয় পায়। কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে। বলে, তাহলে এটা।
মদন বলে, পকিইদে ফুলি, গাড়িয়ার জলে ছাঁটি দে। ফুলি কলসিটাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে। বলে, নাহ্ আমি এট াকে অক্ষ্মীর ঘট করবা।
মদন ঝাঁঝিয়ে ওঠে, খবরদার ফুলি, ও অলক্ষ্মীকে ঘরে ঢুকিইবুনি। তবে তোর একদিন কি মোর একদিন।
মদনকে হঠাৎ এমনভাবে রেগে উঠতে দেখে ফুলি ভয় পেয়ে যায়। লোকটাকে তো সে ভাল করেই চেনে। এমনিতো নিপাট ভালোমানুষ। সরল, সাদাসিধে। তাকে খুব ভালোবাসে। তার কথাও শোনে। কিন্তু রেগে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন যে কী করে বসবে তার ঠিক নেই। এক রোখা মানুষটাকে নিয়ে তার বিপদের শেষ নেই।
অবশ্য মদনের একরোখা স্বভাবের জন্যই তাকে স্বামী হিসাবে পেয়েছে ফুলি। পরীক্ষায় ফেল করে কে না বাপমায়ের হাতে মার খায়। তার জন্য কী কেউ ঘর ছাড়ে ? ছাড়লেও কী আর ফিরে আসে না? রাগের মাথায় প্রতিজ্ঞে তো সবাই করে। ত ার দাম কী? তা আঁকড়ে ধরে থাকে কেউ ?
অথচ মদন তাই করেছিল। ফুলি শুনেছে, ক্লাস সিক্সে দু দুবার ফেল করায় তার বাপ নাকি বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল তাকে। সেদিনই যেমন কথা তেমনি কাজ। ঘর ছেড়ে ভাসতে ভাসতে আরামবাগে গিয়ে ঠেকেছিল মদন। তারপর এক কল বসানো মিস্ত্রির দলে। লেখাপড়ায় মাটো হলে কী হবে বছর দুয়েকের মধ্যে সে হয়ে উঠেছিল পাকা মিস্ত্রি। এই সময়ই একদিন ফুলির সাথে দেখা। তারপর প্রেম শেষে বিয়ে। কিন্তু একতাপুরে আর ফিরে আসেনি। একদম বাপের মরা খবর পেয়ে।
আর ঘরে ফিরে জানতে পেরেছিল তার বাপ মরার আগে তাকে বাঁশ দিয়ে গেছে। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে তার দাদা খবরটা দিয়েছিল। তার বাপ তাকে বাস্তুভিটে, জলজমি কিছুই দিয়ে যায়নি। দিয়ে গেছে হাড়িয়াপানা বলে তাদের যে পে াড়ো জমিটা আছে, সেইটে। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল তার।
মদন এত্তারপুরে থাকবে বলে আসেনি। শ্রাদ্ধশান্তি চুকলেই ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু রাগে তার রোখ গেল। সে সিদ্ধান্ত নিল এখানেই থেকে যাবে। ফুলির শত অনুনয় - বিনয়, কান্নাকাটিতেও মনসার বাহনে ভরা পোড়োজমিকেও বাস্তু বানাব ার হিম্মৎ হরেকিষ্ট ঘোষের নাতির আছে, সে দেখিয়ে দিবে খোলমকুচি আর ভাঙা ইটের ঢিবিতেও সে ফুল ফোটাতে প ারে।
সত্যিই পোড়ো জমিতে ফুল ফোটাতে পেরেছে মদন। এখন সেই জমিকে চেনা দায়। ফুল - ফলের গাছ গাছালিতে সুন্দরভ াবে বেজে উঠেছে জমিটা। শুধু পশ্চিম দিকের ঢিবিটার ইটের আধিক্য বেশি বলে ওটার গায়ে হাতদেয়নি এতদিন। এখন ব াইপাসের লোকেরা এসে পয়সা দিয়ে মাটি কিনে নিতে চাওয়ায় সে হাতে চাঁদ পেয়েছিল। তারা সেই খোঁড়াখুঁড়িতে যে এমন কান্ড ঘটবে তা কে ভেবেছিল ?
মদন হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল। ফুলির বড্ড মায়া জাগে মানুষটার অবস্থা দেখে। তার পিঠে হাত রেখে বলে, চল ঘরকে চল। রাত পুঁইতে আর বেশি দেরি নাই।
হঠাৎ মদন এক কান্ড করে। ফুলিকে জড়িয়ে ধরে হাউমাই করে কেঁদে ওঠে। বলে, ফুলিরে তুই আমার ঘরের লক্ষি।
মিশন বাইপাস সার্জারি
আশপাশের গাঁ - গঞ্জের মানুষ এমন কান্ড সাতজন্মে দেখেনি। হ্যাঁ, একটা রাস্তা হচ্ছে বটে। দাঁড়িয়ে দেখার মত। পথ চলতি মানুষ সত্যি সত্যিই থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে দেখতে থাকে। আর বাড়ি ফিরে বৌ - ঝির কাছে গল্পজুড়ে দেয়। বৌ - ঝি -রা ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে সদ্য শোনা গল্প বলে পাশের বাড়ির গিন্নিকে। চল, মাউসি, সকাল সকাল কাজকাম, রাঁধা বাড়া সারি কি বাইপাস দেখতে যাবা।
যেন একবিংশ শতাব্দী নিজে যেচে ধরা দিতে এসেছে গ্রামের মানুষজনের কাছে। রাস্তা যে এত চওড়া হতেপারে তা কে ভেবেছিল। পুরানো আমলের গোটা ছ-সাতেক পিচের রাস্তা তার গর্ভে ঢুকে যাবে অনায়াসে। রাস্তাটা দাঁতন শহরে না ঢুকে পশ্চিমে বেড় দিয়ে এত্তারপুর ছুঁয়ে আবার পুরনো রাস্তায় উঠেছে। এটাকেই নাকি বলে বাইপাস। এই বাইপাসের জন্য এখন একতার পুরের প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে জমির দাম। হয়তো একদিন এই বাইপাসকে ঘিরে গড়ে উঠবে ঝাঁ চকচকে দোকান পাট, বাড়ি - ঘর, কারখানা। হয়তো জন্ম নেবে নতুন এক শহর। এখন চোখে চোখে এইরকমই স্বপ্ন

উড়ছে।
অবশ্য দুর্জনেরা বলে ধুলো। যা উড়ছে সবই নাকি ধুলো। পেল্লাই পেল্লাই যন্ত্র মাটি কাটছে, মাটি ঢালছে, মাটি ঠেলছে, ম াটি ঠেসছে। সব যন্ত্র। তার আগে ঢালা হয়েছে বালি। সুবর্ণরেখার উপর জমে থাকা বালি প্রায় সাবাড় হয়ে গেছে। দুর্জনেরা তারই ভয় দেখাচ্ছে, বলছে, দেখবু, সুবর্ণরেখা এবার পূর্ব পাড় ঘেঁষিকি বইবে। আর তাহিলেই এদিক্কার গাঁ গুলার অবস্থা টাইট। সব ধবসি যাবে। রাক্ষুসি সুবর্ণরখার পেটে সব চালি যাবে।
তবে বেশিভাগ মানুষ কথাগুলোকে পাত্তা দিচ্ছে না। কেননা, সুবর্ণরেখার তো সেই আগেকার প্রতাপ নেই।সেই আগেক ার ভয়ঙ্কর বান বন্যা-ই বা কোথায়। সুতরাং শুদু শুধু দুর্ভাবনায় মজে কী হবে। তার চেয়ে সবাই জোরসে বলে - জয় বাবা বাইপাস কি - ই --
পোড়া মাটির মুখ
অমলেন্দুবাবু আজ খুব খুশী। গত কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড ছোটাছুটি করতে হয়েছে তাঁকে। কার কাছেই না যাননি তিনি। পঞ্চ ায়েত প্রধান, বিডিও, দারোগা, পার্টির নেতা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সেক্রেটারি, ঘরে মিটিং হল। তিনি সবাইকে বোঝাতে পেরেছেন যে সাতডুবিয়ায় এক গুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হতে চলেছে। এজন্য প্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে স্থ ানটিকে সংরক্ষণ করা। স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নেবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। একটা ইউও যাতে চুরি না যায় সেটা তঁ ারা দেখছেন। এছাড়া তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে, যার কাছ হবে রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান, তদ্বির করা, যাতে এখানে দ্রুত খননকার্য শু করা হয়। অবশ্য তিনি জানেন, এই কমিটি তৈরি করা আর না করা সমান। যা করার তা তাকেই করতে হবে। এবং তিনি তা করবেনও।
তাঁর আনন্দের আরও একটি কারণ, সাতদৌলা রহস্যের সমাধান তিনি প্রায় করেই ফেলেছেন? তিনি নিশ্চিত সাতডুবিয় াই সাতদৌলা। ওখানে যে দেয়াল মাটির ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে, তিনি তার ইট পরীক্ষা করে দেখেছেন। সম্ভবত গুপ্তযুগের, ঐ সময়ই এই এলাকায় দন্ডভুক্তি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সাতদৌলা কি তবে তার রাজধানী ছিল ! নাকি বা ণিজ্যকেন্দ্র?
যাইহোক, হয়তো সেখানে এক বিরাট প্রাসাদ ছিল, যার ছিল সাত সাতটি দেউল। কিংবা সাতটি পৃথক প্রাসাদোপম বাড়ি ও থাকতে পারে। কিংবা সাতটি মন্দির। সেই থেকে স্থানটির নাম সাতদৌলা। আর কালক্রমে তা সুবর্ণরেখার গর্ভে চলে য ায় তাই পরবর্তীকালে স্থানটির নাম হয় সাতডুবিয়া। কিন্তু তা না হয় হল, পরে গ্রামের নাম এত্তারপুরই বা হল কেন? এরও সমাধান সূত্র পেয়ে গেছেন তিনি। এত্তারপুর আসলে একটি পুর, মানে একটি পুর বিশিষ্টস্থান। অর্থাৎ সাতটি পুরের ছটি জলের তলায় তলিয়ে গেলেও, হয়তো তখনও একটি অবশিষ্ট ছিল। তাই একপুর বা একটিপুর বলে পরিচিতি পায় স্থ ানটি। সেই থেকে এত্তারপুর। আবার এমনও হতে পারে মূল এলাকাটি নদী গর্ভে চলে যাওয়ার পর তারই একধারে নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। এজন্যই তা কালক্রমে হয়ে যায় একটেরে পুর। আরও পরে এত্তারপুর। কিন্তু তা যাই হোক, এভ াবেই তো ইতিহাস তৈরি হয়, আমরা তার রহস্য উদঘাটন করতে পারি বা না পারি, ইতিহাস ঘেরাটোপের আড়ালে নিজের মুখ লুকিয়ে মিটিমিটি করে হাসতে থাকে। অমলেন্দুবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল আগামী সেই সব দিন। ম াটি খোঁড়া হচ্ছে, মাটির নীচ থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে প্রাচীন এক নগরের কঙ্কাল। তারপর সেই পোড়ামাটি চোখ মেলে তাকাল। তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন। সেই চোখ সহসা হেসে উঠল। তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কী ঐতিহাসিক, কেমন আছ?
যখের ধন
ক'দিন ধরে মদন বেশ ফুরেফুরে মেজাজে আছে। তার মতো হেঁজিপঁজি মানুষের নামও যে লোকের মুখে মুখে ফিরবে, তা সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি। কথাটা চাউর হয়ে যেতেই কত মানুষের আনাগোনা। কত গণ্যমান্য মানুষের পায়ের ধুলো পড়ছে তার ভিটেয়। গর্বে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। এখন আর বাপের উপর রাগ নেই মদনের। ভাগ্যিস তার বাপ ত ার নামে হাড়িয়াপাদটা দিয়ে গিয়েছিল। তার দাদা - বৌদি নিশ্চয়ই হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে।নিশ্চয়ই তাদেদর কানে যাচ্চে স্কুলের হেডমাস্টার থেকে শু করে বিডিও সাহেব, থানার দারোগা পর্যন্ত তার সাথেক্যামন মদনবাবু মদনবাবু বলে কথা বলছে। মদনের এখন খুশীর সীমা নেই।

এদিকে ফুলির অবস্থা খুব কণ। তাকে দেখে মদন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। কদিন ধরে ভয়ে সিটিয়ে আছে সে। পিতলের কলসির কথা যদি কেউ টের পেয়ে যায়? পাছে পুলিশ এসে বলে, ওটা দিয়ে দাও, ওটা সরকারি সম্পত্তি। তবে ঘটটা দেখে এখন আর বোঝার উপায় নেই যে বহুকাল মাটির নীচে পড়ে ছিল। মেজে মেজে ফুলি পাত্তরটাকে ঝকঝকে করে তুলেছে। প্রথমে তেঁতুল দিয়ে ঘষেছে। তারপর তেল দিয়ে। তারপর তুষ দিয়ে। শেষে ছাই দিয়ে। দু - চারটে কালো দ াগ যে নেই তা নয়, তবে দূর থেকে তা বোঝা যায় না। সেই ঘট এখন লক্ষ্মীপটের সামনে। ভেতরে জল, মাথায় আম্রপল্লব এবং কাঁচা বেল। গায়ের উপর তেল - সিদুঁর, চুয়া, চন্দন। ঘটটার রূপ বেশ খোলতাই হয়েছে। তার কুঁড়ে ঘরে যে কে ানদিন এমন ঘটে পূজা হবে, কে কবে ভেবেছিল! ছেলেমেয়েকে ফুলিবলেছে ঘটটা হাট থেকে কিনে এনেছে। পুরানোই কিনেছে, কম দামে। ফুলির মতন মানুষও পাড়ার বউ ঝিদেরডেকে এনে দেখায়নি। বাচচাওয়ালা মুরগীর মতন এখন তার চ াউনি। পাছে কেউ ঘটটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যখেরধনের মতো আগলে রেখেছে। কে জানে সত্যি সত্যি সে শেষপর্যন্ত ওটাকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে কিনা।

ভো - কাট্টা

শেষ। শিকড় পুরোটাই ছেঁটে দেওয়া গেছে। নিজেকে বেশ হালকা লাগছে শ্রীমন্তর। হালকা, নাকি ভারী?আসলে ভারী কিংবা হালকা বলে কী কিছু হয় ? যে লোকটি সন্তানের ভার অবলীলত্রমে বহন করে, সে কী পিতামাতার ভার বইতে গিয়ে ল্যাজে গোবরে হয় না? কেন এমন হয়?

নিজের ভাবনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত নিজেই অবাক হয়ে গেল। এতদিন লুব - ডাব, ডাব- লুব শব্দ ঘেঁটে সে শরীরের রহস্য বোঝার চেষ্টা করেছে। আর আজ তার কী হল যে সে মনের রহস্যে ঢুকে পড়তে চাইছে। তার প্রিয় শিক্ষক ডক্টর সোম তার হাতে যেদিন প্রথম ছুরি কাঁচি তুলে দিয়েছিলেন। সেদিন বলেছিলেন, সব সময় মনে রাখবে, পেশেন্টের গ ায়ে সিজার ছোঁয়ানোর আগে একজন প্রকৃত ডাক্তারকে নিজের ইমোশানকে ছেঁটে দিতে হয়। সে তো একজন ডাক্তার, ত াহলে কেন এই সামান্য অপারেশনে এতো ইমোশানাল হয়ে পড়ছে।

সকালেই সে বাইপাস দেখতে যায়নি। তবে হাড়িয়াপাদাতে গেছিল। হাড়িয়াপাদার সাথে তার একটা সেন্টিমেন্টাল স ম্পর্ক আছে। ছোটবেলায় বাবা - মায়ের নিষেধ অমান্য করে লুকিয়ে বন্ধুবান্ধবের সাথে সে সেখানে যেত। সাপের ভয় ত াদের দাবিয়ে রাখতে পারত না। কেন না ওখানে ছিল বৈঁচি কুল, ঝাপ কুল, টোপাকুল, নুনিয়া কুলের অমোঘ আহ্বান। অ াজ গিয়ে একদম হতবাক। প্রথমে সে জায়গাটাকে চিনতেই পারেনি। মদন যেএ গাঁয়ে ফিরে এসেছে বসবাস শু করেছে তাও জানত না। মদনকে কিন্তু সে দেখেই চিনেছে। বয়সের পরিবর্তনেও মুখে সেই আগের গবেটমার্কা সারল্য এই রকম রয়েছে। মদনই তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল।

সাধারণ দৃষ্টিতে হয়তো ব্যাপারটা কিছুই নয়। চৌকো চৌকো এবং পাতলা পোড়ামাটির ইটের দেয়াল। চওড়া। মাটি বা লি দিয়ে গাঁথা। এটা এমন কিছু দর্শনীয় নয়। কিন্তু সে ভেবে অবাক হচ্ছিল, তাদের হেলাফেলার ছোট্ট গ্রামের বুকের ভিতর এতো কাল ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল একটি প্রাচীন জনপদের ধবংসাবশেষ, কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। অ ার সে তার নিজস্ব সম্পদের কথা না জেনেই ভিখিরির মতো হাত পেতে দাঁড়িয়েছে আর এক জনপদের দ্বারে।

শ্রীমন্ত আবার ইমোশনাল হয়ে পড়ছে। সে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল। ওটাই তো স্বাভাবিক। নদীর একুল যখন ভাঙে, ওকুলে তখন জেগে উঠছে চড়া। দেখতে দেখতে বালির চড়ার উপর জমে ওঠে পলির স্তর। স্তর পু হয়। মানুষ ল াঙল নিয়ে নেমে পড়ে ভূমি কর্ষণে। বীজ বোনা হয়। হাসি হাসি মুখ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় গাছ। একসময় ফসল ফলে। ম াটি পূর্ণ মাতৃত্বের গর্বে আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলে। এই যে সে সল্টলেকে বাড়ি করেছে, সেখানেও তে া সেই একই খেলা। হ্রদের বুক থেকে জেগে উঠেছে এক মহানগর। কথাটাভেবেই নিজেই লজ্জা পায় শ্রীমন্ত। ফাঁকিটা জলের মতন পরিষ্কার। তাপ্পি দিয়ে কী তা ঢাকা যায়? তবু তাপ্পি দিতে হয়। বেবী স্বাভাবিক ভাবেই আসুক আর টেস্টটিউব বেবীই হোক, সৃষ্টি সৃষ্টিই। ধবংস আর সৃষ্টি, সৃষ্টি এবং ধবংস এতো আবহমানের স্রোত। চলেছিল, চলছে এবং চলবে।

নাঃ, আজ শ্রীমন্তকে ভূতেই পেয়েছে, কেবলই ভারী ভারী চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ছে। ওখানে একটা নো এন্ট্রি বোর্ড টাঙিয়ে দিতে হবে। সে ফুৎকার দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিতে চাইল তার নিজের মধ্যেকার নিজেকে। আর সে অবাক হয়ে দেখল চ

ারপাশের গাছপালা, মাটি - ঘাস, বাতাস - জল- সবাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ভো - কাট্টা ভো - কাট্টা - ভো - কাট্টা --

যাও পাখি

ভ্যান রিক্সায় জিনিসপত্র চাপিয়ে সটান চলে এসেছে স্টেশনে। ফুলি কিছুতেই আসতে চাইছিল না। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছিল। পাড়ার প্রতিবেশীরা সবাই মানা করেছিল। এমনকি পঞ্চায়েত প্রধান গিরিবাবু পর্যন্ত এসে কত বোঝাল। রাগ কোরো না মদন, তুমি তো সরকারি টাকা পাবে। একটা পছন্দমতো জায়গা কিনে নাও, না হয়আমরাই তোমাকে জায়গা দেখে দিচ্ছি। দু এক কাঠা খাস জমির না হয় পাট্টা করে দেব। তুমি দেশ ছেড়ো না। কিন্তুযেখানকার মদন সেখানেই। তার সেই এক গোঁ এটি আর রইভা নি।

অমলেন্দুবাবু খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হয়েছিলেন। তার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। তিনি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। মদন একবার ভেবে দেখ ব্যাপারটা কত গুত্বপূর্ণ। তোমার এই সাতডুবিয়া গ্রাম যে সে গ্রাম নয়। তোমার ভিটে আজ হেলাফেলা জায়গা নয়। তার নীচে হয়তো পাতা আছে রাজ সিংহাসন। সেখানেই এককালে বসত রাজসভা। রাজার পাশে রানি। মন্ত্রী - সেনাপতি কত লোকলস্কর কত হাতি ঘোড়া - সে এলাহি কাণ্ড! সেই সাতডুবিয়া গ্রাম - তোমার ভিটে - ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাবে। তোমার নাম, তোমার ত্যাগ লোকের মুখে মুখে ফিরবে - একি যে সে কথা!

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। কথায় বলে গোয়ালার গোঁ না মোষের গোঁ। ফুলি যখন দেখল কান্নাকাটি করেও মদনের মন ভেজানো যাচ্ছে না, তখন চোখের জল আঁচলে মুছে বাক্স - প্যাঁটরা বাঁধাছাঁদা করতে লেগে গেছিল। অনেক সাধ করে ভিটেটাকে সাজিয়ে দিল। এর ওর বাড়ি থেকে চারা এনে এনে কত ফুল গাছ পুঁতে ছিল। তুলসী মঞ্চ,বিষহরির থানে রোজলেপ াপুছা করত। সাঁজবাতি দিত। গোয়ালে গাই, বাড়িতে হাঁস - মুরগী। একটা ছাগল ভাগে এনে সাতটা ছাগল করেছিল। সব বেচে দেওয়া হল অদরে। তার মনটা কেবলই হু হু করে ডঠছিল। ছুটে চলে যেতে চাইছিল আবার সেখানে। কিন্তু কি করে সে। মানুষটাকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে। সেই যে গুম মেরে গেছে তো গেছে। দরকারি দু- একটা কেজো কথা ছাড়া মুখে রাটি নেই। কোথায় যাচ্ছে তাও ফুলি জানে না। ফোঁস করে বুকের আটকে থাকা বাতাস বাইরে ভাসিয়ে দিল ফুলি। কিন্তু বুক হালকা হল না। যেন বুকের উপর পাথর চাপিয়ে দিয়েছে কেউ।

ট্রেন আসতে দেরি আছে। ছেলে মেয়ে দুটি প্লাটফর্মে ছোটাছুটি করছিল। ফুলি আড়ে আড়ে লোকটার দিকে চায়। জরিপ করে। খানিক ইতস্ততঃ করে, তারপর জিজ্ঞেস করেই ফেলে, হ্যাঁ গো, আমরা আরামবাগে যাইচি তো?

--- কেন, আরামবাগ ছাড়া কী পৃথবীতে জেইগা নাই?

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মদন। তারপর আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। ফুলি আর কথা বলার সাহস পায় না। শুধু উসখুস করে। জিনিসপত্রগুলোকে আর একটু টেনে আনে নিজের কাছে। একটা ফর্সা কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলিকে টেনে এনেএকদম নিজের কোলের ওপর রাখে। তারপর হাত দিয়ে টিপে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে ভেতরের সব কিছু ঠিকঠাকআছে কিনা। আছে দেখে আশ্বস্ত হয়। তারপর আপন মনেই ফিক্ করে হেসে ফেলে। পাশে বসা মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে, ঘটটার কথা কিন্তু কেউ টের পায়নি।

আবার সুবর্ণরেখা

অনের বছর পর সুবর্ণরেখায় বন্যা এলো। প্রকৃতি তো নিজের খেয়ালেই চলে। কখন, কী করে বসে তা হয়তো সে নিজেও জানে না। মানুষ সেখানে শুধু দর্শক মাত্র। কদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। বেশ ভাল বৃষ্টি। শোনা গেল উজানে নাকি আরো তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। পাগলা হাতির মতো তুমুল জলরাশি ধেয়ে এলো নাবালের দিকে। সুবর্ণরখার মরা নদীখাত আজ খল খল করে হাসছে। যেন সে পাগল হয়ে গেছে। শিকল ছেঁড়া সেই পাগলি নীচে আটকে রাখতে পারেনি প্রহরী বাঁধ।

জল এসে ঢুকল সাতডুবিয়াতেও। সবাই সন্ত্রস্ত। হুটো পুটি, ছোটাছুটি। চারদিকে সামাল সামাল রব। কেউকেউ ঘর ছাড়ছে। গ্রাম ছাড়ছে। হাড়িয়াপাদার পোড়া ইটগুলো কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তারা তো জানে সুবর্ণরেখা আজ খেলা করতে বেরিয়েছে। নিছক খেলা। তারা জলের আনন্দে সেই খেলার রহস্যে ডুবে যেতে থাকে। গভীরে-- আরও গভীরে!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com